বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত হয়ে বলছেন মহাবিশ্বের প্রসারণের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অর্থ, ক্রমশ ত্বরান্বিত হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রসারণ। মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থের মিলিত আকর্ষণ প্রসারণের এই উৎসাহ দমিয়ে রাখতে পারছে না। এই ধরনের প্রসারণ যদি অব্যাহত থাকে তাহলে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ আক্ষরিক অর্থে অন্ধকার। মহাবিশ্বের প্রসারণ কখনও বন্ধ হবে না, এবং এক সময়, আলোর উৎসগুলি ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয় করে ফেলার পর, তা অন্ধকারে ডুবে যাবে।

তারার অন্তিম আলো

বিমান নাথ

আইনস্টাইনের ধ্রুবকের বদলে বিজ্ঞানীরা অন্য কিছুর কথা ভাবতে শুরু করেছেন। এমন এক ধরনের শক্তি, যা কোনও ধ্রুবক নয়, যার পরিমাণ মহাবিশ্বের ক্রমশ ক্ষীয়মাণ পদার্থশক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে।

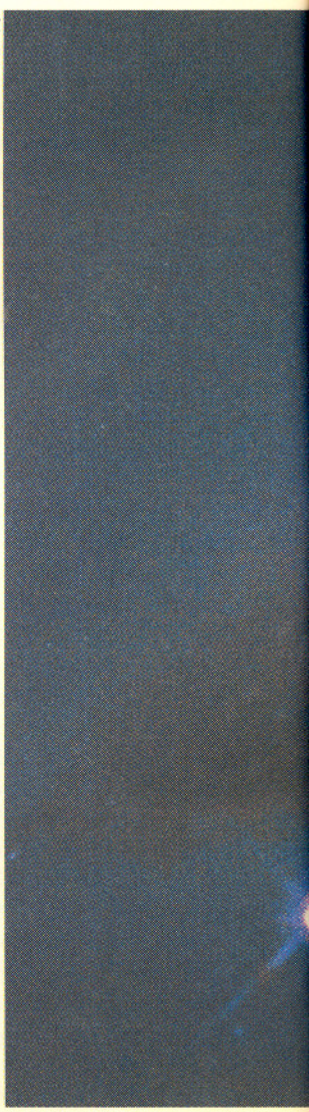

সাল ১৬০৪। গ্যালিলিও গ্যালিলি তখন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ অধ্যাপক। তখনও আবিষ্কার করেননি তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র, তবে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর নতুন ধারণাগুলির জন্য ইতিমধ্যেই বিখ্যাত। আকাশে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর আধুনিক ধারণার প্রমাণ খুঁজলেন।

সেই বছর আকাশে হঠাৎ একটি নতুন, অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা গিয়েছিল, যা কয়েকদিন উজ্জ্বল থাকার পর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। গ্যালিলিওর কাছে এই ঘটনা ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

নক্ষত্রের জগৎকে সবসময়ই আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে ভিন্ন মনে করা হয়েছে। তাকে ভাবা হয়েছে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। আমাদের পরিবর্তনশীল জগতের মতো সাধারণ দ্রব্য দিয়ে তৈরি নয় সে, অন্য কিছু দিয়ে গড়া। পঞ্চভূতের চারটি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ, অর্থাৎ, মাটি, জল, আগুন ও বায়ু— এদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাচীন পাশ্চাত্য দর্শনে এদেরকেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মৌলিক উপাদান বলে ভাবা হয়েছিল। তখন নক্ষত্রের জগতের উপাদানকে ভাবা হয়েছিল এই চারটির থেকে একেবারে আলাদা কিছু। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ব্যোম'— অ্যারিস্টটলের ভাষায় 'পঞ্চম ভূত' (Fifth Essence বা Quintessence)। পরবর্তীকালে 'Quintessence' শব্দটি হয়ে দাঁড়ায় শুদ্ধতার প্রতীক, এবং এর থেকে আসে 'Quintessence' অর্থাৎ কোনও কিছুর প্রকৃত রূপ।

১৬০৪-এর এই 'নতুন নক্ষত্র'র আবির্ভাবের দু'মাস পর গ্যালিলিও কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন পাদুয়ায়। গ্যালিলিও ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছিলেন যে এই নতুন নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে রয়েছে, অন্তত চাঁদের থেকেও দূরে। অর্থাৎ এটা সত্যিই নাক্ষত্রিক জগতের বাসিন্দা। সেই বক্তৃতাগুলিতে গ্যালিলিও বলেছিলেন, আকাশে এই 'নতুন নক্ষত্র'র আবির্ভাব সহজেই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে নক্ষত্রের জগৎ অপরিবর্তনীয় নয়। অর্থাৎ, ব্যোম নয়, নক্ষত্রের জগৎও সাধারণ দ্রব্য দিয়েই তৈরি। এই যুক্তি দিয়ে তিনি দেখাতে চাইলেন, এত বছর ধরে অ্যারিস্টটলের দর্শনে যেসব ধারণা মেনে আসা হয়েছে— যেমন, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্যের ঘূর্ণনের ধারণা, সে-সবের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। এর পরের কাহিনী অবশ্য সকলের জানা।

এবারে ইতিহাসের পাতা উল্টে প্রায় চারশো বছর পেরিয়ে সোজা ১৯৯৮ সালে চলে আসা যাক। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। শুধু গ্রহদের গতিবিধির ব্যাখ্যা নয়, বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের উপাদান, কাঠামো এবং জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। আমরা এখন জানি যে সূর্য তথা সকল নক্ষত্রই আমাদের পরিচিত দ্রব্য দিয়ে তৈরি। নক্ষত্র থেকে আসা আলোর বর্ণালীতে কীভাবে এইসব সুপরিচিত দ্রব্যের চিহ্ন খুঁজে নিতে হয়, তার বিশ্লেষণ তো বাঙালি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাই করেছিলেন। তাই 'ফিফ্‌থ এসেন্স' শব্দটা বৈজ্ঞানিক অভিধানের বাইরে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু ১৯৯৮ সালে আকাশে কিছু নোভা বা 'নতুন নক্ষত্র' পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা আবার সেই ব্যোমের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। তবে নক্ষত্রের উপাদান হিসাবে নয়, এবার একে সমগ্র মহাবিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এইসব পর্যবেক্ষণ আলোড়ন তুলেছে। এমনকী ১৯৯৮ সালে এই পর্যবেক্ষণটিকে ওই বছর পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যদিও অনেক বিজ্ঞানী এখনও এই গবেষণাকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখছেন— ব্যোমের

পি এস এ-র সৌজন্যে

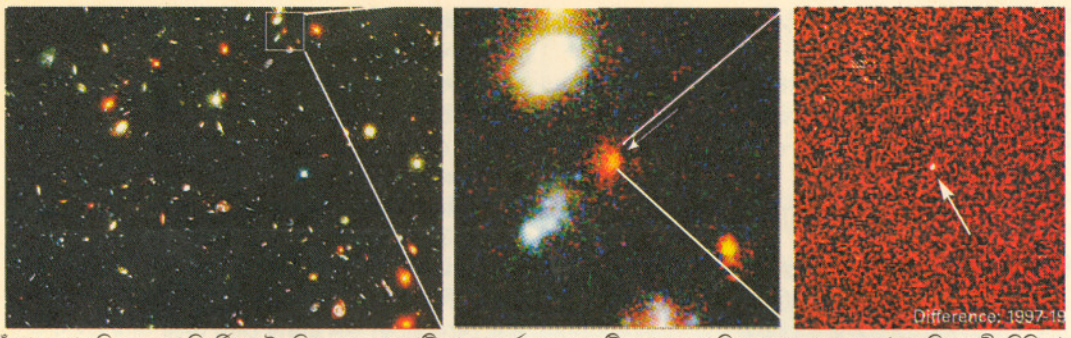

বাঁ থেকে ডান দিকে ক্রমশ বিবর্ধিত এই ছবিতে ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ ধরা পড়েছে (ডান দিকে, তীরচিহ্নিত)

এবং বিশ্বের ভবিতব্য

একটি সর্পিল গ্যালাক্সির কেন্দ্রের উজ্জ্বল্যের সঙ্গেও যেন পাল্লা দিচ্ছে একটি নক্ষত্রের অন্তিম আলো, বাঁ দিকে কোণায়

গ্যালিলিও বলেছিলেন, আকাশে এই 'নতুন নক্ষত্র'র আবির্ভাব সহজেই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে নক্ষত্রের জগৎ অপরিবর্তনীয় নয়। অর্থাৎ, 'ব্যোম' নয়, নক্ষত্রের জগৎও সাধারণ দ্রব্য দিয়েই তৈরি।

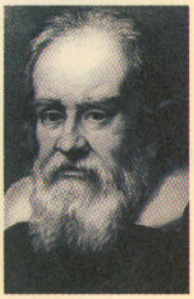

অস্তিত্বের আরও নির্ভরশীল প্রমাণ চান তাঁরা— তবে অনেকেই এই গবেষণায় সোৎসাহে নেমে পড়েছেন।

এঁরা ব্যোমের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবছেন, তা চমকে দেওয়ার মতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যোমের এই পুনরাবির্ভাবের ব্যাপারটা সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

বিশ্বতত্ত্বের গোড়ার কথা

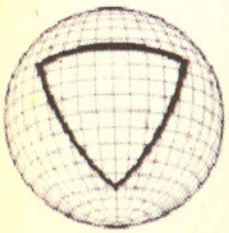

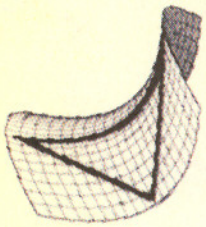

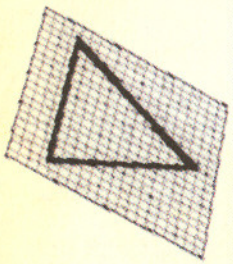

প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে সমস্ত মহাবিশ্ব ব্যাপ্ত করে ছিল ঘন এবং উত্তপ্ত পদার্থ (বা গ্যাস), এবং বিকিরণ। তখন থেকে মহাবিশ্বের দেশ (Space) প্রসারিত হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে মহাবিশ্বের আয়তন। এর ফলে এই গ্যাসীয় পদার্থ ধীরে ধীরে হালকা এবং শীতল হয়েছে। ক্রমশ এই গ্যাস পুঞ্জীভূত হয়ে তৈরি করেছে অণু-পরমাণু, গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ও আমাদের মহাবিশ্বের যাবতীয় দৃশ্য বস্তু। এই যে মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ, এর ভবিষ্যতে কী রয়েছে?

আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারণের নির্দেশক হল মহাবিশ্বের দেশের জ্যামিতি, এবং সেই সঙ্গে মহাবিশ্বে শক্তির স্বরূপ ও তার পরিমাণ। আমরা দেশের জ্যামিতিকে সাধারণত স্কুলে শেখা ইউক্লিডের জ্যামিতি বলেই ধরে নিই। অর্থাৎ, একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হল ১৮০ ডিগ্রি, ইত্যাদি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আইনস্টাইন প্রমাণ করেছিলেন যে আমাদের চারপাশের এই দেশের জ্যামিতি এত সহজ নয়। তার তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। এই জ্যামিতি কোথাও কোথাও ইউক্লিডের নিয়ম মেনে চলতেও পারে, আবার এও হতে পারে যে এর নিয়ম একেবারে অন্য রকম।

একটি তলের কথা ভাবা যাক, যার শুধু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ রয়েছে, উচ্চতা বলে কিছু নেই। এই তলের জ্যামিতি হতে পারে তিন ধরনের— একটি ক্ষেত্রে এই তলের ওপর আঁকা কোনও ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হবে ১৮০ ডিগ্রির বেশি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম, তৃতীয় ক্ষেত্রে ১৮০ ডিগ্রির সমান। প্রথমটির আকার হবে বলের মতো গোল, দ্বিতীয়টি হবে ঘোড়ার জিনের মতো বক্র, আর তৃতীয়টি হবে আমাদের সুপরিচিত সমতল (বাঁদিকের ছবি)।

আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণ মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখেছিলেন যে মহাবিশ্বের দেশের জ্যামিতিও তিন ধরনের হতে পারে। অবশ্য এখানে শুধু দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিশিষ্ট কোনও তলের জ্যামিতি নয়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা বিশিষ্ট আমাদের চারপাশের দেশের জ্যামিতির কথা ভাবা হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, মহাবিশ্বের দেশে ইউক্লিডের নিয়ম খাটতেও পারে, আবার নাও খাটতে পারে। এর জ্যামিতি সামতলিক হতে পারে, আবার বক্রও হতে পারে।

সাধারণত মহাবিশ্বের দেশের জ্যামিতি নির্ভর করে মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণের ওপর। যদি মোট শক্তি খুব বেশি হয় তাহলে এর জ্যামিতি হবে বলের ওপরের তলের মতো। যদি তা খুব নগণ্য হয়, এই জ্যামিতি তাহলে হবে ঘোড়ার জিনের তলের মতো। আর এর মাঝামাঝি পরিমাণের হলে জ্যামিতি হবে সামতলিক।

প্রশ্ন হল, এই শক্তির পরিমাণ কতটুকু?

এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভেবে এসেছিলেন যে মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি আসলে তার পদার্থের ভরের মধ্যেই নিহিত। আইনস্টাইনই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভর এবং শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ ($E = mc^2$)বলে দেয় কতটুকু ভরের মধ্যে কতটুকু শক্তি নিহিত রয়েছে। বিজ্ঞানীরা তাঁদের অঙ্কে এই শক্তিই ব্যবহার করে এসেছিলেন।

তবে কয়েকটি নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার ফল তাঁদের এই বিশ্বাসে আঘাত করেছে। একদিকে বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানতে পেরেছেন যে আমাদের মহাবিশ্বের জ্যামিতি হল সামতলিক। এতে আমাদের চিরপরিচিত ইউক্লিডের নিয়ম খাটে। আবার অন্যদিকে তাঁরা এও জানতে পেরেছেন যে মহাবিশ্বের জ্যামিতি এমন হওয়ার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, তা জোগান দেওয়ার মতো পদার্থ নেই আমাদের মহাবিশ্বে। দেশের জ্যামিতি আর মহাবিশ্বের শক্তির পরিমাণের যোগসূত্রে কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যেন বাজার সেরে ফিরে আমি হিসাব করে দেখলাম, যত টাকার জিনিস হাতে পেয়েছি, বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক কম টাকা নিয়ে। বাকি জিনিসপত্র তাহলে নিশ্চয় কোনও দোকানদার ভুল করে আমায় দিয়ে দিয়েছে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে বলতে হয়, হিসাবের বাইরের এই শক্তিটুকুর উৎস এমন কিছু, যার সম্বন্ধে আমরা এখনও অজ্ঞ।

মহাবিশ্বের জ্যামিতি

গত দশকে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের জ্যামিতি সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করেছেন। বিশেষ করে 'মহাজাগতিক বিকিরণ'-এর গবেষণায়। এই বিকিরণ সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে রয়েছে। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তার পদার্থ যেমন ক্রমশ শীতল হয়েছে, তেমনই এই বিকিরণও ক্রমশ তার উত্তাপ বা শক্তি হারিয়েছে। বর্তমানে এই বিকিরণ তার পূর্বপরাক্রম হারিয়ে এক অতি মৃদু গুঞ্জনে পর্যবসিত হয়েছে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের এই বিকিরণটি বিজ্ঞানীদের কাছে মহাবিশ্বের ইতিহাসে একটি জীবাশ্মের মতো। সুদূর অতীতের তথ্য এই বিকিরণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

আমরা যখন স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরনোর পর বন্ধুবান্ধবদের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তখন আমাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য থাকে স্কুলের শেষদিনে তোলা কোনও ছবি। মহাবিশ্বের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এমন একটি ব্যাপার ঘটেছে। বিকিরণ ও পদার্থ শুরুতে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। পরে মহাবিশ্ব শীতল হয়ে এলে তাদের বন্ধুত্বের উত্তাপও কমে আসে। বিশেষ করে মহাবিশ্বের প্রায় তিন লক্ষ বছর বয়সের পর— যে-সময়ে তার তাপমাত্রা নেমে প্রায় চার হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়েছিল, বিকিরণ ও পদার্থ আর মেলামেশা করার সুযোগ পায়নি। কারণ তাপমাত্রা যথেষ্ট নেমে আসায় একমাত্র তখনই পরমাণু সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, এবং পরমাণুর সঙ্গে মহাজাগতিক বিকিরণের মেশার সুযোগ খুব কম।

মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের এই বিকিরণটি বিজ্ঞানীদের কাছে মহাবিশ্বের ইতিহাসে একটি জীবাশ্মের মতো। সুদূর অতীতের তথ্য এই বিকিরণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

১৯৬৫ সালে এই মহাজাগতিক বিকিরণের আবিষ্কার আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিল। এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারটির জন্য আর্নো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁরা অবশ্য দেখেছিলেন যে এই বিকিরণের উষ্ণতা আকাশের সকল অংশেই সমান।

প্রায় দশ বছর আগে এই বিকিরণের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা গেল আকাশের বিভিন্ন অংশে এই বিকিরণের উষ্ণতায়, খুব কম হলেও, কিছুটা বৈষম্য রয়েছে। উষ্ণতার এই তারতম্য হল অতীতের মহাবিশ্বে পদার্থের অসমানভাবে ছড়িয়ে থাকার প্রমাণ। পদার্থ

যেখানে কিছুটা জমাট বেঁধেছিল, সেখানে অতিরিক্ত মহাকর্ষের ফলে বিকিরণ কিছুটা শক্তিক্ষয় করেছিল। হারিয়েছিল তার উষ্ণতা। (এটাও আইনস্টাইনের তত্ত্বের ফল!) আর অতীতের এই জমাট-বাঁধা পদার্থ থেকেই বর্তমানের গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ইত্যাদি সকল কিছুর উৎপত্তি হয়েছে।

মহাজাগতিক বিকিরণের উষ্ণতায় এই সূক্ষ্ম তারতম্য বিজ্ঞানীদের কাছে আর একটি তথ্য নিয়ে এসেছে। এই তারতম্যের জন্য আমরা বিকিরণের তাপমাত্রা-মানচিত্রে দেখতে পাই উষ্ণ ও শীতল অংশ, যার জন্য দায়ী অতীতে (মহাবিশ্বের বয়স যখন প্রায় তিন লক্ষ বছর, যখন মহাজাগতিক বিকিরণের উৎপত্তি হয়েছিল) পদার্থের জমাট বাঁধা। বিজ্ঞানীরা কিন্তু সহজেই এই জমাট বাঁধা পদার্থগুলির আকার অঙ্ক কষে বার করতে পারেন। আর তার সঙ্গে আকাশে মহাজাগতিক বিকিরণের উষ্ণ ও শীতল অংশের আকার তুলনা করতে পারেন।

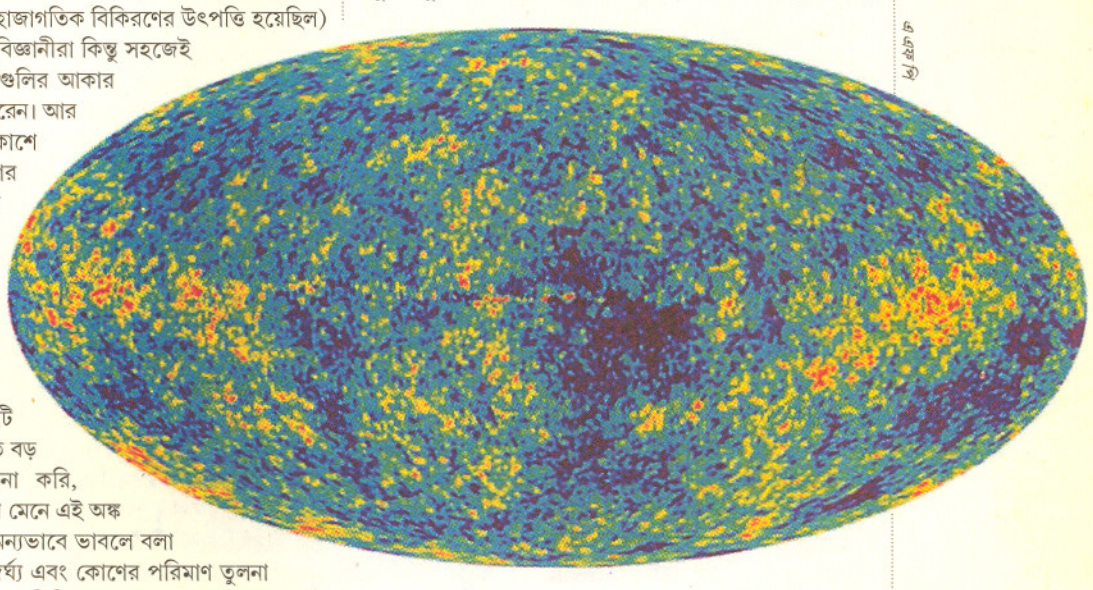

যেমন আমি যদি কোনও প্রকারে জানতে পারি হাওড়া ব্রিজের দৈর্ঘ্য কত, এবং তার থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে তাকে কত বড় দেখায় তা যদি তুলনা করি, তাহলে জ্যামিতির নিয়ম মেনে এই অঙ্ক মিলে যাওয়া উচিত। অন্যভাবে ভাবলে বলা যেতে পারে যে এই দৈর্ঘ্য এবং কোণের পরিমাণ তুলনা করলে আমরা দেশের জ্যামিতি কেমন তা জানতে পারব। এই জ্যামিতি স্কুলে শেখা ইউক্লিডের নিয়ম মেনে চলছে, না এই জ্যামিতি তার চেয়ে জটিল কিছু। ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফলের মতো এটাও হবে জ্যামিতির পরীক্ষা।

বিজ্ঞানীরা ২০০০ সালে কিছু সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মহাজাগতিক বিকিরণের উষ্ণ ও শীতল অংশের আকার সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। বিশ্বতত্ত্বের অঙ্ক অনুযায়ী যদি মহাবিশ্বের দেশের জ্যামিতি সামতলিক হয় তাহলে এই উষ্ণ ও শীতল অংশের আকার হওয়া উচিত প্রায় এক ডিগ্রি। জ্যামিতি যদি বলের ওপরের তলের মতো হয়, তবে এই আকার হওয়া উচিত আরও বড়, এবং ঘোড়ার জিনের তলের মতো জ্যামিতির ক্ষেত্রে এই আকার হওয়া উচিত অপেক্ষাকৃত ছোট। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বেলুনে পাঠানো কয়েকটি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্ধারণ করেছেন এর মাপ প্রায় এক ডিগ্রিই বটে। অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্বের দেশের জ্যামিতি খুব সম্ভবত সামতলিক, সুতরাং তা ইউক্লিডের জ্যামিতি মেনে চলে।

কিন্তু এই সামতলিক জ্যামিতির সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ঠিক খাপ খায় না। তাঁরা গ্যালাক্সিগুলির গতিবিধি দেখে মহাবিশ্বে মোট পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, দেশের জ্যামিতি সমতল হওয়ার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, মহাবিশ্বের মোট পদার্থে তার শুধু এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে। অবশিষ্ট থাকে প্রায় দুই তৃতীয়াংশের হিসাব। এই অবশিষ্ট শক্তির উৎস কোথায়?

নক্ষত্রের মৃত্যু ও মহাবিশ্বের প্রসারণের হার

শুধু যে শক্তির হিসাবে ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা-ই নয়, বিজ্ঞানীরা এই অবশিষ্ট শক্তির কিছু অদ্ভুত ধরনের প্রভাব লক্ষ করেছেন। যদি দেশের জ্যামিতি সামতলিক হয় তাহলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া উচিত। নিউটন যদিও বলেছিলেন যে ভরের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ রয়েছে, আইনস্টাইনের মতে বিভিন্ন ধরনের শক্তিও মহাকর্ষীয় শক্তির দাবিদার। তাই মহাবিশ্বের মোট শক্তি তার মহাকর্ষের দৌলতে ক্রমশ এই প্রসারণকে স্তিমিত করে আনবে, এটাই স্বাভাবিক। একটি পাথরকে ওপরের দিকে ছুঁড়লে যেমন তার গতিবেগ পৃথিবীর মহাকর্ষের জন্য ধীরে ধীরে কমে আসে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাঁদের নতুন কিছু পরীক্ষায় দেখেছেন যে মহাবিশ্বের প্রসারণের হার কমছে না, বরং বেড়েই চলেছে।

মহাবিশ্বের কোনও গ্যালাক্সির আলোর বর্ণালী থেকে তাঁরা জানতে পারেন এই আলো কবে বিকিরিত হয়েছে। কারণ মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে আলোর তরঙ্গেরও প্রসারণ ঘটে। আর আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে তার রং। যে-আলোর রং অতীতে নীল ছিল, সেই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্ধিত হলে তার রং সরে আসবে লালের দিকে। তাই বিজ্ঞানীরা সুদূর কোনও জ্যোতিষ্কের আলো পরীক্ষা করে তার বিকিরণের সময় জানতে পারেন।

এর সঙ্গে জানতে হয় ওই জ্যোতিষ্কের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য। কারণ এরকম অনেকগুলি নক্ষত্রের লাল-সরণ আর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের ক্ষীণ হয়ে আসার শতাংশমাত্রা থেকে বিজ্ঞানীরা বার করতে পারেন মহাবিশ্বের প্রসারণের হার একই রয়েছে, নাকি তার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। পৃথিবী থেকে কোনও নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য কেমন দেখায় তা আমরা সরাসরিই জানতে পারি। সুতরাং বাকি থাকে তার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য জানা।

কিন্তু এই দ্বিতীয় তথ্যটি জোগাড় করা বেশ কঠিন। দূরত্ব জানা না থাকলে কোনও জ্যোতিষ্কের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য কী তা বলা প্রায় অসম্ভব। সেটা কী ধরনের নক্ষত্র, অথবা গ্যালাক্সি তা কে জানে! সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই গবেষণায় নক্ষত্রের মৃত্যুর পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিয়েছেন।

নক্ষত্রের মৃত্যু

রাত্রির আকাশে নক্ষত্রগুলি দেখে আমাদের মনে হতে পারে এরা বুঝি অনন্তকাল একই ভাবে আলো বিকিরণ করবে। আসলে এক একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তি আলোর আকারে বিকিরিত হচ্ছে। এই পারমাণবিক বিক্রিয়ার জ্বালানি এক

মহাজাগতিক বিকিরণের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে আকাশের বিভিন্ন অংশে খুব সূক্ষ্ম হলেও তাপমাত্রার ফারাক রয়েছে (উপরের ছবি দ্রষ্টব্য, বিভিন্ন রং বিভিন্ন উষ্ণতা নির্দেশ করছে)। **উষ্ণতার এই তারতম্য হল অতীতের মহাবিশ্বে পদার্থের অসমানভাবে ছড়িয়ে থাকার প্রমাণ।**

সময় ফুরিয়ে আসে। তখন নক্ষত্রের ভাগ্যে থাকে নানান ধরনের বিপর্যয়। কখনও কোনও নক্ষত্র নিজেকে এক বিস্ফোরণে ধ্বংস করে দেয়, আবার কখনও মহাকর্ষের কবলে পড়ে ক্ষুদ্রাকার হয়ে থাকে।

১৯৩০-এর দশকে সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর আবিষ্কার করেছিলেন যে, কোনও নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৪৪ গুণের কম হলে সেটি এই ক্ষেত্রে একটি বামন নক্ষত্রে পরিণত হবে। তখন তার মধ্যে কোনও পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটবে না, শুধু অবশিষ্ট তাপ বিকিরণ করে সে ধীরে ধীরে আলোর জগৎ থেকে চিরবিদায় নেবে। নক্ষত্রের ভর এর বেশি হলে কিন্তু এমন শান্তিতে দিন কাটানো যাবে না। তার ভাগ্য হবে বেশ জটিল। এই নির্দিষ্ট ভরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন 'চন্দ্রশেখর ভরসীমা'। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৮৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

যাই হোক, কখনও কখনও এই বামন নক্ষত্রের কিছু সঙ্গী নক্ষত্র থাকে। বামন নক্ষত্রের আলো বিকিরণ করার বিশেষ ক্ষমতা না থাকলেও, তার মহাকর্ষের আবদার কম নয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রায়ই বামন নক্ষত্র তার সঙ্গী নক্ষত্র থেকে কিছু পদার্থ শুষে নেয়। এমন করে পদার্থ চুরি করতে করতে যদি বামন নক্ষত্রটির ভর 'চন্দ্রশেখর ভরসীমা' পেরিয়ে যায়, তাহলেই নক্ষত্রে লেগে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। যাকে বলা যায় অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। এক প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণে সে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। বিজ্ঞানীরা এই ধরনের বিস্ফোরণের নাম দিয়েছেন 'Type 1 Supernova', এবং এগুলি তাঁরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছুরিত আলোর কিছু বিশেষ চিহ্ন থেকে তাঁরা সহজেই এই বিস্ফোরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেন।

(গ্যালিলিও ১৬০৪ সালে এমনই একটি বিস্ফোরণকে 'নতুন নক্ষত্র' বলে ভেবেছিলেন। ইতালীয় ভাষায় 'নতুন' হল 'নোভা'— তাই এইসব বিস্ফোরণের নাম দেওয়া হয়েছে 'নোভা', এবং বিশাল বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে, 'সুপারনোভা'।)

সবচেয়ে বড় কথা হল, বিজ্ঞানীদের মতে এই বিস্ফোরণের ঔজ্জ্বল্য একটি ধ্রুবক, এর নড়চড় হয় না। এগুলো এক-একটা মার্কামারা ইলেকট্রিক বাল্বের মতো, যার ওপর সেটা কত ওয়াটের তা পরিষ্কার লেখা থাকে। এই ধ্রুব ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তার আপাত ঔজ্জ্বল্য তুলনা করে বিজ্ঞানীরা সহজেই নক্ষত্রটির আলো কতটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে তা মেপে নিতে পারেন। কাজেই মহাবিশ্বের প্রসারণ অতীতে বেশি ছিল না কম ছিল সেটা নক্ষত্রের এই রকম মৃত্যু থেকে সহজেই মেপে নেওয়া সম্ভব।

অবশ্যই এ-কাজ করতে গেলে সুদূর মহাবিশ্ব থেকে আসা বিস্ফোরণের অতি ক্ষীণ আলো নিয়ে পরীক্ষা করার ক্ষমতা থাকা চাই। উন্নত প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে এই ধরনের গবেষণা বর্তমানে সম্ভব। পৃথিবীর বড় বড় দূরবীক্ষণগুলির সঙ্গে এতে শামিল হয়েছে মহাকাশে অবস্থিত হাবল্ দূরবীক্ষণ। এই গবেষণায় ১৯৯৮ সালে প্রথম কিছু ফল পাওয়া গিয়েছিল। তার পর থেকে বিজ্ঞানীরা নিয়মিত এই ধরনের পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত পাওয়া ফলাফল বিচার করে বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত হয়ে বলছেন মহাবিশ্বের প্রসারণের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর অর্থ হল, ক্রমশ ত্বরান্বিত হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রসারণ। মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থের মিলিত আকর্ষণ প্রসারণের এই উৎসাহ দমিয়ে রাখতে পারছে না। এই ধরনের প্রসারণ যদি অব্যাহত থাকে তাহলে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ আক্ষরিক অর্থে অন্ধকার। মহাবিশ্বের প্রসারণ কখনও বন্ধ হবে না, এবং এক সময়, আলোর উৎসগুলি ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয় করে ফেলার পর, তা অন্ধকারে ডুবে যাবে।

ব্যোম

বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলির সারমর্ম তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে : মহাবিশ্বে এক ধরনের শক্তি রয়েছে যার উৎস পদার্থ নয়, এখনও অজানা কিছু। এবং এই শক্তি মহাকর্ষের মতো মহাবিশ্বকে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করছে না, তার প্রসারণের হার ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে এই অজানা শক্তি বিকর্ষক চরিত্রের।

আইনস্টাইনের তত্ত্বে শক্তির মহাকর্ষীয় আকর্ষণ রয়েছে। এখানে দেখছি এই সদ্য আবিষ্কৃত শক্তির বিকর্ষণ-ধর্ম রয়েছে। এই শক্তি কি তাহলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব মেনে চলছে না? এটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু গভীরে যেতে হবে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও কিছুর মহাকর্ষীয় শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে (শক্তির ঘনত্ব + ৩ × চাপ)-এর ওপর। স্কুলে শেখা নিউটনের সূত্রে তাতে মহাকর্ষের সঙ্গে বস্তুর চাপের কোনও সম্পর্ক নেই। মহাকর্ষের সঙ্গে চাপের এই সম্বন্ধটি আইনস্টাইনের আবিষ্কার। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতায় দেশ (স্পেস) এবং কালের (টাইম) একটি মিলিত রূপ দিয়েছিলেন— তারই ফল হল এই সম্পর্কে চাপের আবির্ভাব। এখানে '৩' এসেছে আমাদের ত্রিমাত্রিক দেশের দৌলতে।

সাধারণত, শক্তির ঘনত্বের তুলনায় চাপ হয় অতি নগণ্য। তাই ভরের ঘনত্ব যত বেশি হয়, শক্তির ঘনত্বও হয় তত বেশি এবং মহাকর্ষের আকর্ষণও দাঁড়ায় তত বেশি। নিজেকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখার উৎসাহও হয় তত বেশি। এমন করেই তো এক-একটা ব্ল্যাক হোল, বা অন্ধকূপ-এর উৎপত্তি হয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে চাপ ঋণাত্মক হয় এবং (শক্তির ঘনত্ব + ৩ × চাপ)-এর মোট যোগফল ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে মহাকর্ষের মোট আকর্ষণ হবে ঋণাত্মক। অর্থাৎ, সেই শক্তি হবে বিকর্ষক।

ঋণাত্মক চাপের অর্থ কী? এমন অবস্থা হলে কোনও বস্তু বাইরের দিকে চাপ দেবে না, ভেতরের দিকে কুঁকড়ে যেতে চাইবে। যেমন সেতারের তারগুলিকে জোরে টেনে রাখা হয় বলে এরা সবসময় ছোট হওয়ার চেষ্টা করে। এই তারগুলির চাপ ঋণাত্মক। এই উদাহরণটি অবশ্য কিছুটা কৃত্রিম, কারণ এখানে তারগুলিকে জোরে টেনে রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এমন কোনও কপাল চাপড়ানো চাপের কথা ভাবা কঠিন (যদিও অসম্ভব নয়)। ভাবতে অবাক লাগে যে এমন ভেতরের দিকে নিজেকে টেনে রাখা কোনও বস্তুর মহাকর্ষীয় শক্তি হবে বিকর্ষক।

অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। আইনস্টাইন নিজেও অবাক হয়েছিলেন। কারণ তিনিও এক সময় তাঁর অঙ্ক মেলাবার জন্য এমন একটি শক্তির কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে একে অনর্থক বলে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কারণ এর সাহায্য ছাড়াই তাঁর অঙ্কের ফলের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ মিলে গিয়েছিল। তিনি এই শক্তির নাম দিয়েছিলেন 'মহাজাগতিক ধ্রুবক' (Cosmological Constant)। এই কাল্পনিক শক্তিকে শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শক্তি বলে ভাবা

১৯৩০-এর দশকে সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর আবিষ্কার করেছিলেন যে, কোনও নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৪৪ গুণের কম হলে সেটি এই ক্ষেত্রে একটি বামন নক্ষত্রে পরিণত হবে।

হয়েছিল।

শূন্য দেশের আবার কী শক্তি থাকতে পারে? আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অবশ্য শূন্যতাকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যেখানে কোনও পদার্থ নেই, সেখানেও কিছুটা শক্তি থাকতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে শূন্য দেশকে আপাত দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হলেও, তার অতি সূক্ষ্ম স্তরে সবসময় নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তির থেকে পদার্থকণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হচ্ছে আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। এমনতর মিলন-বিরহের পালা ঘটে চলেছে অহরহ। পদার্থবিজ্ঞানীরা অবশ্য এই শক্তির পরিমাণ আজও সঠিকভাবে কষে বার করতে সক্ষম হননি। তবে তাঁদের প্রাথমিক অনুমান যতটুকু ছিল, তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। পদার্থবিজ্ঞানীদের অঙ্ক সঠিক হলে শূন্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি খুব বেশি হত (১০-এর পর ১২০টা শূন্য বসালে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, ততগুণ বেশি!)। এই শক্তির বিকর্ষণ-মাত্রাও হত অকল্পনীয়। এর উন্মত্ত টানে মহাবিশ্বের অণু-পরমাণু-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি সৃষ্টির কোনও সুযোগ থাকত না। নিশ্চয় কোথাও একটা গলদ রয়েছে এই অঙ্কে।

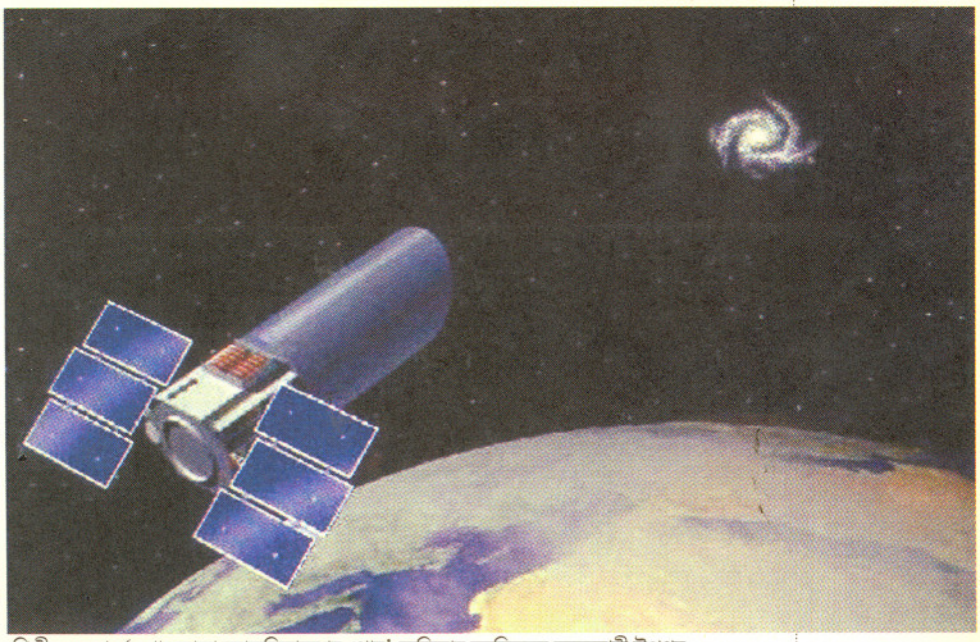
নাসা-র সৌজন্যে

শিল্পীর কল্পনায় 'সুপারনোভা অ্যাকসিলারেশন প্রোব', অতিকায় দূরবিনযুক্ত অনুসন্ধানী উপগ্রহ

আইনস্টাইন কল্পিত এই শক্তির আর একটা অনর্থকারী দিক হল, এটি একটি ধ্রুবক। এর অর্থ, মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে, এবং এই সঙ্গে পদার্থশক্তির ঘনত্বও হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু শূন্যতার এই কাল্পনিক শক্তি থাকছে একই রকম। এদিকে আমরা জেনেছি যে মহাবিশ্বের এখনও অবধি অজানা শক্তির মান হল পদার্থশক্তির মাত্র দুই গুণ (মোট শক্তির দুই-তৃতীয়াংশ)। একদিকে পদার্থশক্তি মহাবিশ্বের জন্মের পর থেকে কোটি কোটি গুণ কমে গিয়ে আধমরা হয়ে রইল, অন্যদিকে এই ধ্রুবক শক্তি চিরযুবকের মতো একই মানের রয়ে গেল। এবং এ-সত্ত্বেও এই দুই শক্তির মান বর্তমানে প্রায় সমান। এটা কাকতালীয় হতে পারে, তবে কেমন যেন মনে একটু খুঁতখুঁত রয়ে যায়, কারণ বিজ্ঞানীরা কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখেন। এরকম কিছুকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন তাঁরা।

বিজ্ঞানীরা তাই আইনস্টাইনের এই ধ্রুবকের বদলে অন্য কিছুর কথা ভাবতে শুরু করেছেন। এমন এক ধরনের শক্তি, যা কোনও ধ্রুবক নয়, যার পরিমাণ মহাবিশ্বের ক্রমশ ক্ষীয়মাণ পদার্থশক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে। শুধু শূন্যতায় নয়, তাঁরা এই অজানা শক্তিকে কোনও পদার্থের মধ্যে নিহিত শক্তি বলেও ভাবছেন। আপাতত এই কাল্পনিক পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'ফিফ্‌থ এসেন্স'— 'পঞ্চম ভূত', অর্থাৎ ব্যোম।। এ পর্যন্ত শুধু এটুকুই জানা আছে যে, এই 'পঞ্চম ভূত'টি বেশ কিম্ভূতকিমাকার; এর চাপ ঋণাত্মক এবং এর শক্তি বিকর্ষক। হয়তো ব্যোমের সঙ্গে সাধারণ পদার্থ ও বিকিরণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং এর শক্তি পদার্থ শক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। সুতরাং মহাবিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা হল মানুষ-প্রাণী-গ্রহ-নক্ষত্র যা দিয়ে গড়া তেমন কোনও সাধারণ পদার্থ নয়, বরং ব্যোমের মতো কোনও সৃষ্টিছাড়া পদার্থ।

তবে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় বা অঙ্কে এমন অসাধারণ পদার্থের খোঁজ মিলবে না। তার জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত প্রমাণ। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্বের শুধু একটা আভাস পেয়েছেন মাত্র। তবে এই ব্যোম যদি সত্যিই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকে, তবে তার অস্তিত্বের কিছু বিশেষ সংকেত পাওয়া যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। এবং তাঁরা আশা করছেন যে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন। যেমন, তাঁদের মতে এই ব্যোম মহাবিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকবে না। এর বিস্তৃতি কিছুটা অসমান হওয়া উচিত। এবং ঠিক যেমন করে পদার্থের জমাট বাঁধার চিহ্ন বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের উষ্ণ ও শীতল অংশে খুঁজে পেয়েছেন, ঠিক তেমনি ব্যোমের জমাট বাঁধার চিহ্নও তাঁরা খুঁজে পাবেন বলে আশা করছেন। অবশ্য এই চিহ্ন হবে অতি, অতি সূক্ষ্ম। তবে এই নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা চলেছে, এবং এর জন্য কী ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা নিয়েও ভাবছেন বিজ্ঞানীরা।

এই গবেষণার জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী মহাকাশে একটি বিশাল দূরবীক্ষণ যন্ত্র পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন। যদি NASA এই প্রকল্পে সায় দেয়, তাহলে প্রায় ২ মিটার বড় একটি আয়না সহ এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি (SNAP–Supernova Accelertion Probe) ২০০৮ সাল নাগাদ পাঠানো হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে তাঁরা এর সাহায্যে বছরে একটি-দু'টি নয়, প্রায় হাজার খানেক মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রের সন্ধান পাবেন। এইসব তথ্য হবে ব্যোমের স্বরূপ নির্ধারণের গবেষণায় অমূল্য সম্পদ।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের গবেষণা যেন কোপার্নিকাসের মতবাদকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে চলেছে। প্রথমে আমরা জানলাম যে আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে নয়। তারপর জানলাম যে, আমাদের সূর্য আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে নয়, তার এক পাণ্ডববর্জিত প্রান্তে অবস্থিত এক গড়পড়তা ভরের নক্ষত্র। তারপর জানা গেল আমাদের গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের কেন্দ্রে তো নয়ই, বরং এক প্রসারমাণ মহাবিশ্বের এক সাধারণ বাসিন্দা মাত্র। এখন জানা যাচ্ছে যে এই সব নক্ষত্র-গ্যালাক্সি যে পদার্থ দিয়ে তৈরি, মহাবিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকা নিতান্ত গৌণ। এর মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে এক অজানা ভয়ঙ্কর শক্তি।

মহাবিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা হল মানুষ-প্রাণী-গ্রহ-নক্ষত্র যা দিয়ে গড়া তেমন কোনও সাধারণ পদার্থ নয়, বরং ব্যোমের মতো কোনও সৃষ্টিছাড়া পদার্থ।

লেখক বাঙ্গালোরের রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণারত জ্যোতির্বিজ্ঞানী।